।। উপন্যাস থেকে নাটক : 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাস থেকে 'আরোগ্য নিকেতন' নাটক ।।

(এক)

'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫৩) ।

তারাশংকরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-কীর্তি, 'সম্ভবত সর্বাধিক আলোচিত ও পঠিত উপন্যাস ।'[১] "সমগ্র বাংলা সাহিত্যে তো বটেই, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেও 'আরোগ্য নিকেতন' লেখকের বিশিষ্ট সৃষ্টি, বিশিষ্ট রচনা বলে পরিগণিত হয়েছে ।"[২] তাই তারাশংকরের জীবিতাবস্থাতেই গ্রন্থটি 'সাহিত্য অকাদেমী' কর্তৃক ভারতের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশ পায় । মলয়ালম ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ করেন অধ্যাপিকা নিনীনা আব্রাহাম । এছাড়া হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, তামিল ও তেলেগু ভাষায়ও গ্রন্থটি অনূদিত হয় । গ্রন্থটির ইংরেজী অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় । ১৯৫৫ সালে গ্রন্থটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক রবীন্দ্র পুরস্কার এবং ১৯৫৬ সালে সাহিত্য অকাদমী কর্তৃক অকাদমী পুরস্কার লাভ করে । বস্তুত, যে ক'টি রচনা তারাশংকরের খ্যাতিকে সারা ভারতে ছড়িয়ে দিয়েছে তাদের মধ্যে 'আরোগ্য নিকেতন' অন্যতম । ১৯৬৯ সালে তারাশংকরকে সাহিত্য অকাদমীর 'ফেলোশিপ' প্রদান উপলক্ষে যে প্রশস্তি পত্র দেওয়া হয় তাতে 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় ।

তারাশংকর নিজেও 'আরোগ্য নিকেতন'-কে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বলে মনে করতেন । ১৩.১.৫৬ তারিখে ব্যোমকেশ মজুমদারকে লেখা পত্রে তার প্রমাণ আছে ।[৩] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও লিখেছেন – "শুনেছি তারাশংকরের নিজের সব চাইতে প্রিয় বই 'আরোগ্য নিকেতন' ।"[৪]

প্রাচীন ও নবীন, ঐতিহ্য ও প্রগতির দ্বন্দ্ব তারাশংকরের প্রিয় বিষয়। নানা ধরনের রচনায় নানাভাবে তিনি এই বিষয়টি প্রয়োগ করেছেন। 'আরোগ্য নিকেতনে' ব্যাধি ও তার চিকিৎসার বিচিত্র পদ্ধতির বিন্যাসে প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্বের বিষয়টি রূপায়িত। এমনি রূপায়ণ দেখি 'বোবা কান্না' গল্পে।

'বোবা কান্না' গল্পটিকে ঠিক 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের বীজ গল্প বলা যায় না। তবে উপন্যাসটির বেশ ক'বছর আগে লেখা গল্পটিতে উপন্যাসের বিষয় ও চরিত্রায়নের খানিকটা আভাসিত হয়েছে বৈকি।

'বোবা কান্না' (১৩৫১) গল্পে মিহির ডাক্তারের বৈজ্ঞানিক মানসের সঙ্গে আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিশ্বাসী, চণ্ডীমায়ের পূজক, অকৃত্রিম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ত্রিপুরা ভট্টাচার্যের দ্বন্দ্ব প্রদর্শিত হয়েছে। গল্পটির পটভূমিতে রয়েছে পঞ্চাশের মন্বন্তর। "বোবা কান্না' মন্বন্তরের পল্লীমহাকাব্য। ছোটগল্পের আঙ্গিকে ওতে পঞ্চাশের মন্বন্তরে বিধ্বস্ত রাঢ়ের পল্লীজীবন সামগ্রিকভাবে পরিস্ফুট হয়েছে।" [৫] মৃত্যুর এই ভয়াবহ পটভূমিতে দাসী চোর শশী এক স্বামীহারা সন্তানবতী তরুণীর প্রতি সহমর্মিতায় কিভাবে মানুষ হয়ে উঠল গল্পটিতে প্রধানত এটাই দেখানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রাচীনপন্থী ত্রিপুরা ভট্টাচার্যের সঙ্গে নবীনপন্থী মিহির ডাক্তারের দ্বন্দ্বের ওপর লেখক বেশী গুরুত্ব দেন নি। তবু 'আরোগ্য নিকেতনে'-র বিষয়ের কিছুটা আভাস এতে পাওয়া যায়।

তারাশংকরের বেশ ক'টি রচনায় চিকিৎসক ও চিকিৎসাবৃত্তি স্থান পেয়েছে। এই সূত্রে তাঁর প্রথম জীবনে লেখা বিখ্যাত গল্প 'দেবতার ব্যাধি'-র উল্লেখ করতে হয়। ডাক্তার গড়গড়ির চরিত্রটি কঠোর ও কোমল চিত্তবৃত্তিতে গড়া। তাঁর সুপরিচিত উপন্যাস 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' শিরবেদে সম্প্রদায় এবং ধূর্জটি কবিরাজ ও শিষ্য শিবরাম কবিরাজকে নিয়ে লেখা। এই উপন্যাসে বিলীয়মান বেদে

সম্প্রদায় এবং সর্প-চিকিৎসা ও আয়ুর্বেদ সম্পর্কে তারাশংকরের বিপুল অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়।

(দুই)

তারাশংকর তাঁর সাহিত্যিক-জীবনের শুরু থেকেই মৃত্যুর স্বরূপ নিয়ে চিন্তা করেছেন। "তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার একটি প্রধান বিষয়ই ছিল মৃত্যু-ভাবনা।" [৬] তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিচিত্র মানুষের বিচিত্র ধরনের বহু মৃত্যু দেখেছেন। 'আমার কালের কথা' (১৯৫১) গ্রন্থে মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর বিবিধ অভিজ্ঞতার বিবরণ মেলে। [৭] ব্যক্তি-জীবনে মৃত্যুকে ঘনিষ্ঠভাবে প্রথম দেখেছিলেন পিতার মৃত্যুকালে (১৯০৬ সাল)। সে অভিজ্ঞতা বিবৃত হয়েছে তাঁর স্মৃতিকথায়। [৮] তিনি লিখেছেন— "অকস্মাৎ কাল এসে দাঁড়াল। তাকে যেন স্বচক্ষে দেখেছিলাম। ..... স্বচক্ষে মৃত্যু দেখলাম প্রথম। আমিও যেন কেমন হয়ে গেলাম। আতঙ্কিত অভিভূত আমি থরথর করে কাঁপতে লাগলাম।" [৯] এরপর মৃত্যুর আঘাত সবচেয়ে বেশি পেয়েছিলেন কন্যা বুলুর মৃত্যুতে (১৯৩২)। পিতার মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র আট। তাই মৃত্যুর নির্মমতা ততটা অনুভূত হয় নি। কন্যার মৃত্যুতে তা প্রবলভাবে অনুভূত হ'ল। 'স্মৃতিকথা'য় তারাশংকর লিখেছেন— (১) "সংসারের সঙ্গে সকল বন্ধন আমার কেটে গেল ছিঁড়ে গেল — এই আঘাতে।" [১০] (২) "মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ানো। অসহ্য তীব্র বেদনায় ছুটে পলাতে ইচ্ছে হচ্ছে।" [১১] (৩) "বুলুর মৃত্যুর আঘাত জীবনে যেন সমস্ত বর্তমানের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করে দিয়েছিল। নোঙর-ছেঁড়া নৌকার মতো আমার জীবন ছুটে চলতে চাইছিল।" [১২] এই মৃত্যুশোকের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ায় রচিত হয়েছিল 'বেদেনী' গল্প-সংগ্রহের অন্তর্গত 'বাগী মা' গল্পটি (১৩৪৪)। গল্পটির শুরুতেই এই প্রতিক্রিয়ার সুস্পষ্ট অভিপ্রকাশ — "বাগীর আগে আমার আর একটি মেয়ে হইয়াছিল — কালো মেয়ে,

একটি চোখ ট্যারা, তার নাম দিয়াছিলাম 'বুলবুল'। বুলবুল শেষে সংক্ষিপ্ত হইয়া বুলুতে পরিণত হইয়াছিল। সেই বুলু অকস্মাৎ একদিন চলিয়া গেল।" কন্যা-বিয়োগ-ব্যথা লেখক এ-গল্পে প্রকাশ করেছেন – "প্রথমটা সে আঘাতে পাগলের মত হইয়া গিয়াছিলাম। এখনও মধ্যে মধ্যে মনে হয়, অপূর্ব সে আঘাত। মানুষ যে কতখানি ভালবাসিতে পারে শোকের নির্মম আঘাত না হইলে সে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না।" আবার এই শোক লেখককে জীবনের এক মৌল সত্যের মুখোমুখি করে – "শোক আস্বাদে অতি তীব্র কিন্তু অপূর্ব, তাহার প্রভাব অতি পবিত্র। শোকে মানুষকে উদার করে, পঙ্কিল হীনতার ঊর্ধ্বলোকে লইয়া যায়।"

বুলুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে লেখা হল 'শ্মশানঘাট' গল্পটি। 'বঙ্গশ্রী'-তে গল্পটি 'সন্ধ্যামণি' নামে প্রকাশিত হয় (মাঘ, ১৩৩১)। লেখকের মতে এই গল্পটি থেকেই তাঁর 'সত্যকার সাহিত্য-জীবনের শুরু।' সমালোচক সেই মত সমর্থন করেন, "মহৎ প্রতিভার আত্মবিকাশের মূলে থাকে একটি মহৎ বেদনা। বাল্মীকির কবিত্ব-লাভের কাহিনী তারি রূপক। কন্যাবিয়োগের মর্মবিদারী বেদনা বুকে নিয়ে তারাশঙ্কর-প্রতিভার আবরণভঙ্গ হল। রচিত হল 'সন্ধ্যামণি' গল্প।"[১৩] লেখক বলেছেন– এই গল্পে "কন্যাহারা উদাসী নায়কের যে অন্তর-বেদনা ফুটে উঠেছে সে আমারই বেদনা।"[১৪] বুলুর মৃত্যু তারাশংকরের লেখায় ইতস্তত ছাপ রেখে গেছে —"আমার গল্প-উপন্যাসের কয়েক ক্ষেত্রেই বুলুকে হারানোর বেদনার কথা আছে।"[১৫] শেষ জীবনে মৃত্যুশোক আবার তাঁকে অভিভূত করেছিল যখন ১৯৬২ সালে তাঁর অত্যন্ত স্নেহের জ্যেষ্ঠ জামাতা কবি শান্তিশংকর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়।

(তিন)

'আরোগ্য নিকেতন'– উপন্যাসের বিষয়বস্তু বিচিত্র ও অভিনব। মানুষের শাশ্বত জীবন-জিজ্ঞাসার একটি প্রধান বিষয় — মৃত্যু-ভাবনাকে নিয়ে উপন্যাসটি

গড়ে উঠেছে। 'সিঙ্গলকেশিনী', 'বিচিত্ররূপিণী' মৃত্যুকে যেন তিনি সচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁর এই মহৎ রচনায়। ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসটির বিষয়ের অভিনবত্বের প্রতি সংকেত করেছেন —

> "ইহার উপজীব্য জীবনলীলা নহে, জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম-ছন্দে রূপায়িত জীবনদর্শন। ইহার অনুভূতি উপরিভাগের বিচিত্র জীবন-চাঞ্চল্যে সীমাবদ্ধ নহে, জীবনের চরম পরিণতি ও আপাত-বৈরী মৃত্যুর গহনরহস্যময়, গুহানিহিত স্বরূপ-আবিষ্কারে নিয়োজিত। এখানে জীবন-সংঘটন মরণের ছায়াতলে অভিনীত, ইহার বহির্বিকাশগুলি মরণের মহাসঙ্গমে আসিয়া স্তব্ধ হইয়াছে।"[১৬]

ভারতীয় দর্শন-পুরাণ-মহাকাব্যে মৃত্যু নিয়ে বিবিধ তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। কিন্তু মৃত্যুর অপার রহস্যময়তা, অনিবার্যতা নিয়ে সার্থক উপন্যাস রচনা সহজ নয়। কারণ মৃত্যুরহস্যকে উপন্যাসে প্রাধান্য দিলে তা ঘটনাকে গ্রাস ক'রে তত্ত্বমুখী গদ্য-নিবন্ধে পর্যবসিত হতে পারে। ফলে উপন্যাস বাস্তবতার স্পর্শ হারায়।

'আরোগ্য নিকেতনে' 'জীবনের লীলাছন্দ ও বিসর্পিত ভাববৈচিত্র্য'[১৭] প্রায় অনুপস্থিত বলে কোনো কোনো আলোচক এতে তারাশঙ্করের শক্তির ম্রিয়মানতা-র পরিচয় পেয়েছেন। কিন্তু সাধারণ উপন্যাসের সঙ্গে এই উপন্যাসটির মৌলিক পার্থক্য আছে। কারণ, —

> "যে উপন্যাস মৃত্যুর স্বরূপ-উপলব্ধিকেই বিষয়বস্তুরূপে নির্বাচন করিয়াছে, যাহা বিভিন্ন চিকিৎসা-প্রণালীর অন্তর্নিহিত দার্শনিকতত্ত্বকেই পরিস্ফুট করিতে ব্যাপৃত, যাহা মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন, শোকবিমূঢ়, আকস্মিক বিপৎপাতে সন্ত্রস্তবিহ্বল জীবনখণ্ডাংশগুলিতেই নিবদ্ধদৃষ্টি, তাহাতে

জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপ, উচ্ছ্বসিত প্রাণপ্রবাহ ও চরিত্রাঞ্জনের গভীরপ্রবেশী জটিলতা প্রত্যাশা করা অসঙ্গত।" [১৮]

মৃত্যুতত্ত্বই এই উপন্যাসের প্রধান বিষয়। ফলে সাধারণ উপন্যাসে জীবনের যে সতেজ, বিচিত্র বিকাশ লক্ষ্য করা যায় এখানে তা নেই। মৃত্যুর সম্মুখীন হ'য়ে জীবন এখানে তার স্বভাবধর্ম হারিয়ে ফেলেছে, জীবনের রক্তিম পরিপূর্ণতা এখানে অনুপস্থিত। ফলে সাধারণ উপন্যাস বিচারের মাপকাঠি এই উপন্যাস-বিচারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নয়।

তারাশংকর তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শুরু থেকেই মৃত্যুর স্বরূপ নিয়ে চিন্তা করেছেন। আত্মকথায় তার প্রমাণ মেলে [১৯]। তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার একটি প্রধান বিষয়ই ছিল মৃত্যু-ভাবনা। মৃত্যুভাবনা ও জীবনজিজ্ঞাসা প্রতিনিয়ত তাড়িত করেছে তাঁকে। তাঁর প্রথম দিকের বিখ্যাত গল্প 'ছলনাময়ী'-তে মৃত্যুচিন্তা ও মৃত্যুঞ্জয়ী হবার সাধনার কথা আছে। এই গল্পে মৃত্যুর কাছে মানুষের পরাজয়ের কাহিনী তান্ত্রিক কয়লাখনির ম্যানেজারের কথায় বর্ণিত —

"আর প্রভুত্ব? কি প্রভুত্ব আছে সম্রাটের? মৃত্যুর গ্রাস হতে রক্ষা করতে পারে সে? মৃত্যু যখন আসে তখন সে সাধারণ মানুষের মত ভগবান ভগবান বলে নির্মম প্রকৃতির পায়ে মাথা কোটে। অন্ধ মানুষ জানে না— নির্মম নিষ্ঠুরা প্রকৃতি ক্রন্দনে টলে না, প্রার্থনায় নিষ্ঠুরার মত ব্যঙ্গ করে চলে যায়।"

তারাশংকরের কথাসাহিত্যে জীবন-জিজ্ঞাসা ও মৃত্যু-চিন্তা বিজড়িত হ'য়ে প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি তাঁর রোমান্টিক প্রেমকাহিনীগুলিতেও। এমনটা ঘটেছে বারবার —

"যে কোনো মহৎ শিল্পীকেই যে জীবন-জিজ্ঞাসা
প্রতিনিয়ত তাড়িত করে — জীবনের সব আনন্দ অঞ্জলিবদ্ধ
করে পান করতে গিয়ে হঠাৎ আবার অতর্কিতে পিছিয়ে
আসতে হয় — জীবনের নশ্বরতায় সব কিছুকে অর্থহীন
মনে হয় — তারাশঙ্করের প্রধান এবং শ্রেষ্ঠতম রচনার মধ্যে
সে প্রশ্ন সে জিজ্ঞাসার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে।" [২০]

'কবি' উপন্যাসে নিতাই কবিয়ালের কণ্ঠে যে জীবন-জিজ্ঞাসা ধ্বনিত তা মানুষের চিরন্তন জীবন-জিজ্ঞাসা ও নিতাইয়ের স্রষ্টা জীবনশিল্পী তারাশংকরেরও জীবন-জিজ্ঞাসা —

"এই খেদ মোর মনে
ভালবেসে মিটল না আশ, ফুরালো না এ জীবনে।
হায়! জীবন এত ছোট কেনে,
এ ভুবনে।"

জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে লেখকের মৃত্যু-চেতনার সংযোগ 'আরোগ্য নিকেতনে' চূড়ান্ত শিল্পরূপ পরিগ্রহ করেছে।

"আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের বিষয়বস্তু সাময়িক নয়, চিরন্তন। ভারতবাসীর মনে যে মৃত্যু-জিজ্ঞাসা আছে — মৃত্যুর দর্শন সম্বন্ধে যে চিরন্তন জিজ্ঞাসা আছে, মৃত্যুর রহস্যময়তা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা-বিস্ময়-মিশ্রিত অনুভূতি আছে, তাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে এই উপন্যাস।" [২১]

ভারতীয় চেতনায় মৃত্যু জীবনের শেষ নয়, নবতর অধ্যায় [২২]; তা কোনো অশুভ পরিণাম নয়, জীবনের পরিপূর্ণতা। মৃত্যুর আলোকেই জীবনের চরম সত্যের উদ্ভাস হয়। ভারতীয় দর্শনে "জীবন-মৃত্যুকে একটি অখন্ড প্রবাহ বলে মেনে

নেওয়া হয়েছে। মৃত্যু ধ্বংস নয়, চিরাবসান নয়। মৃত্যুর পরিণামে পুনরায় জন্মগ্রহণ — এভাবেই জন্ম-জন্মান্তর মৃত্যুর সূত্রে গাঁথা পড়ে।"[২৩]

ভারতীয় ঐতিহ্যকে অনুসরণ ক'রে মৃত্যুর প্রশান্ত রূপই তারাশংকর 'আরোগ্য নিকেতনে' বেশি ক'রে এঁকেছেন। মরণের বীভৎসতা নয়, তার নেপথ্যের রহস্যময়তা পরিবেশনে লেখকের আগ্রহ উপন্যাসটিকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় ভূষিত করেছে। মহাভারতে মৃত্যুদেবীর আবির্ভাবকাহিনী থেকে শুরু ক'রে উনিশ ও বিশ শতকের বিজ্ঞানের মরণজয়ের অভিযানের কথা এখানে আছে। জীবন মশায়ের দীর্ঘ চিকিৎসক জীবনের অভিজ্ঞতার সূত্রে আমরা মৃত্যুর রহস্যময় জগতে পরিক্রমা করি। তবু এই উপন্যাসে "মৃত্যুরহস্য বিশ্লেষণের চেষ্টা তত্ত্বসর্বস্ব হয়নি, পাঠকের অনুভবের স্তরে তীব্রতা জাগিয়েছে।"[২৪]

(চার)

এঙ্গেলস্ আইডিওলজি ও বিয়ালিটির দ্বন্দ্ব দেখেছিলেন বালজাকের রচনায়, লেনিন দেখেছিলেন টলস্টয়ের রচনায়। তারাশংকরের লেখায় এই দ্বন্দ্বের পরিচয় বারবার মেলে।

সামন্ততান্ত্রিক পরিমণ্ডলে তারাশংকর জন্মেছেন ও বড় হয়েছেন। সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সনাতন ধর্ম, দেশাচারের প্রতি পিছুটান সর্বদাই তিনি অনুভব করেছেন। 'তথাকথিত ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য জীবনাদর্শের আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত আইডিওলজি।'[২৫] অথচ প্রাচীনের প্রতি দুর্মর আকর্ষণ সত্ত্বেও কালের পরিবর্তনকে তিনি রূপায়িত করেছেন বিচিত্রভাবে।

ঐতিহ্য ও প্রগতির দ্বন্দ্বে অতীত ঐতিহ্য প্রীতি ও বর্তমান যুগমানসের প্রতি সমর্থন সংক্রান্ত দ্বিধার একটি উজ্জ্বল নিদর্শন 'আরোগ্য নিকেতন'। এক ধরনের 'অধ্যাত্মবোধ' যাকে তারাশংকর 'ঐতিহ্যবোধ' বলে মনে করতেন, 'আরোগ্য নিকেতনে' তার 'সার্থক অনুবর্তন ও সম্প্রসারণ' কেউ কেউ লক্ষ্য করেছেন [২৬]। কিন্তু 'সাহিত্যের চিত্রপটে স্থিতি অপেক্ষা গতি আঁকা শক্ত।' তারাশংকর সেই শক্ত কাজটিই করতে সচেষ্ট হয়েছেন এক্ষেত্রে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে 'আরোগ্য নিকেতনে' লেখকের উদ্দেশ্য জীবন-মৃত্যুর তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন অথবা অ্যালোপ্যাথি বনাম আয়ুর্বেদের ঝগড়া বর্ণনা। কিন্তু 'উপন্যাস তো শুধু গল্প বা কাহিনী রচনা নয়, গল্প বা কাহিনীর স্থিতি-ধর্মিতা ছাড়িয়ে ঔপন্যাসিক জীবন-সামগ্রের গতিধর্মিতাকে তুলে ধরেন'। [২৭] আর এই চলৎশক্তিই উপন্যাসের প্রাণ।

মানুষের জীবন স্থির নয়। নানা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে তা এগিয়ে চলে। আর ব্যক্তি যেহেতু সমাজ-নিরপেক্ষ নয় তাই ব্যক্তির বিকাশের চিত্রে সমাজের রূপান্তরের জটিল রূপও ফুটে ওঠে। তাই 'উপন্যাসের যথার্থ বিষয় হয়ে ওঠে ব্যক্তির মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজ —— সমাজের গতীয় (dynamic) রূপান্তর।' [২৮]

বর্তমান উপন্যাসে তারাশংকর ব্যক্তির ক্রমবিকশিত চেহারাকে বৃহত্তর দেশকালের পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন। 'দেশকালের সঙ্গে তাঁর (তারাশংকরের) নিবিড় যোগ সব উপন্যাসেই ধরা আছে, আর দেশকালের গতিময় রূপ তাঁর উপন্যাসকে দিয়েছে সামাজিক তাৎপর্য।' [২৯]

(পাঁচ)

'গণদেবতা'য় যেমন চণ্ডীমণ্ডপ , 'আরোগ্য নিকেতনে' তেমনি জীবন মশায়ের 'কোবরেজখানা'। 'গণদেবতা'য় চণ্ডীমণ্ডপের ভগ্নদশা বর্ণিত, 'আরোগ্য নিকেতনে'-ও 'কোবরেজখানা'-র জীর্ণদশা রূপায়িত —

"এখন ভাঙা-ভগ্ন অবস্থা; মাটির দেওয়াল ফেটেছে , চালের কাঠামোটায় কয়েক জায়গাতেই জোড় ছেড়েছে — মাঝখানটা খাঁজ কেটে বসে গেছে কুঁজো মানুষের পিঠের খাঁজের মতো। কোনো রকমে এখনও খাড়া রয়েছে — প্রতীক্ষা করছে তার সমাপ্তির ; কখন সে ভেঙে পড়বে সেই ক্ষণটির পথ চেয়ে রয়েছে।" পুরনো কাল যে শেষ হতে চলেছে সে-বিষয়ে লেখকের অসংশয়িত বিশ্বাস এখানে প্রকট। ফলে আরোগ্য নিকেতনের রূপক-তাৎপর্য অস্পষ্ট থাকে না।

আরোগ্য নিকেতনের মতো জীবন মশায়ের বিদায়ের কালও আসন্ন। জীবন মশায়ের চেহারার বর্ণনায় তা আভাসিত —

> "প্রায় সত্তর বছর বয়স ; স্থবির, ধূলিধূসর, দিক-হস্তীর মতো প্রাচীন। একদালের বিশাল দেহের কাঠামো কুঞ্চিত দেহচর্মে ঢাকা; বক্ষপঞ্জর প্রকট হয়ে পড়েছে , মোটা মোটা হাত — তেমনি দুখানি পা , সামনে .... প্রকাণ্ড আকারের অতিজীর্ণ একজোড়া জুতো, পরনে থান-ধুতি — তাও সেলাই-করা; শোভা শুধু শুভ্র গজদন্তের মতো পাকা দাঁড়ি-গোঁফ ; মাথার চুলও সাদা — কিন্তু খাটো করে ছাঁটা।"

অন্যত্র জীবনমশায়ের বর্ণনা —

> "আজ তাঁর অবস্থা গজভুক্ত কপিত্থের মতো।"

অথচ অতীতের প্রতি মোহমুগ্ধতা এখানেও স্পষ্ট —

"সেকালে অর্থাৎ যখন আরোগ্য নিকেতন প্রথম স্থাপিত হয়েছিল তখন ধারা ছিল অন্যরকম। দেশের অবস্থাও ছিল আর-এক রকম। গোলায় ধান ছিল, গোয়ালে গাই ছিল, ভাঁড়ারে গুড় ছিল, পুকুরে মাছ ছিল। লোকে এক হাতে পেট পুরে খেত — দুহাতে পুণ্যপণে খাটত। দেহে ছিল শক্তি মনে ছিল আনন্দ।"

সেকালের জন্য এই দীর্ঘনিশ্বাসে প্রাচীনের প্রতি লেখকের পক্ষপাত স্পষ্ট ফুটে ওঠে। একালের প্রতি বিরূপতাও অস্পষ্ট থাকে না — কারণ একালের মানুষেরা 'দেহে জীর্ণ, মনে ক্লান্ত, দৃষ্টিতে সন্দিগ্ধ'।

প্রাচীনের প্রতি মুগ্ধতা সত্ত্বেও তারাশংকর পরিবর্তনের অনিবার্যতাকে নিশ্চিতভাবে রূপায়িত করেছেন, কালান্তরের বাস্তবতাকে অস্বীকার করেন নি। —

"একটি নতুন কাল শুরু হয়েছে। দেশের কেন্দ্রস্থল নগরে নগরে তার অনেক আগে শুরু হলেও এ অঞ্চলে (দেবীপুর গ্রাম) তখন তার আরম্ভ।"

নগরকেন্দ্রীয় বিজ্ঞানভিত্তিক যন্ত্রনির্ভর ধনতান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাতে সামন্ততান্ত্রিক কৃষিনির্ভর ঐতিহ্যভিত্তিক গ্রাম-প্রধান সমাজ-ব্যবস্থা ও সংস্কৃতির ভাঙনকে তারাশংকর তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় রচনায় বিচিত্ররূপে প্রদর্শন করেছেন। গ্রাম-সমাজের ভাঙন তাঁকে মর্মান্তিক বেদনা দিয়েছে, অথচ তাঁর বাস্তবদৃষ্টিকে এই বেদনার বাষ্প আচ্ছন্ন করে নি। এইখানেই তাঁর মহত্ত্ব।

'আরোগ্য নিকেতনে' চিকিৎসাবিদ্যার প্রেক্ষিতে প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব রূপায়িত হয়েছে। এখানে দ্বন্দ্ব শুধু কবিরাজি বনাম অ্যালোপ্যাথি নয়, এমনকি অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপদ্ধতির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপদ্ধতির নয়, দ্বন্দ্বের মূল

আরো গভীরে —— রোগ , রোগী , চিকিৎসা ও আরোগ্য সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা ও নবীন ধারণার বিরোধ ।

জীবনমশায়ের ধারণার পশ্চাতে আছে ভাববাদী দর্শন , ঐতিহ্য — তথা অধ্যাত্মবোধ । অন্যদিকে প্রদ্যোত ডাক্তারের ধারণার মূল বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিকতা । নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে এ দু'য়ের দ্বন্দ্ব চিত্রিত হয়েছে । জীবন মশায়ের পুরনো ধরনের চিকিৎসাপদ্ধতি , নাড়ীজ্ঞান , নিদান হাঁকাকে প্রদ্যোত কঠোর সমালোচনা করলেও কয়েকটি ক্ষেত্রে , বিশেষ ক'রে প্রদ্যোতের স্ত্রীর চিকিৎসায় এদের কার্যকারিতায় সে মুগ্ধ হ'য়ে বলেছে —— 'এ আপনার কাছে আমার শিখতে ইচ্ছে করেছে ।' এইভাবে প্রাচীন-নবীনের সমন্বয়সাধনের এক করুণ প্রয়াস উপন্যাস-শেষে লক্ষ্য করা যায় ।

অথচ সমাজবিবর্তনের অনিবার্য প্রক্রিয়ায় জীবনমশায়ের চিন্তাধারা ও চিকিৎসাপদ্ধতিও যে ইতিহাসে স্থান পাবে , সে-বিষয়েও বিয়ালিস্ট তারাশংকরের কোনো সন্দেহ থাকে না । ইতিহাস – সচেতন তারাশংকর জানেন — "দিন যায় , ফেরে না । দিনের সঙ্গে কাল যায় । কালের সঙ্গে গতকালকার নূতনের বয়স বাড়ে , পুরনো হয় , জীর্ণ হয় , যা জীর্ণ হয় তা যায় ।" প্রদ্যোতের কণ্ঠে স্বভাবতই নতুন কালের মাহাত্ম্য বিঘোষিত হয়েছে —"নতুন কাল । বিজ্ঞানের যুগ । অদৃষ্ট নিয়তি নির্বাসনের যুগ । ব্যাধিকে জয় করবে মানুষ । মৃত্যুর সঙ্গে সে যুদ্ধ করবে । মৃত্যুর মধ্যে অমৃত খুঁজেছে মানুষ —— অসহায় হয়ে । এবার জীবনের মধ্যে অমৃত সন্ধানের কাল এসেছে ।" এমনকি জীবন মশায়ের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয় নতুন কালের মহিমা —— "মৃত্যুকে জয় করা যাবে না , কিন্তু মানুষ অকালমৃত্যুকে জয় করবে । নিশ্চয় করবে ! ধন্য আবিষ্কার ! ইউরোপের মহাপণ্ডিতদের প্রণাম করেছিলেন । হ্যাঁ — আজ বেদউ তোমরাই ।" শেষ পর্যন্ত জীবন মশায় অনুভব করেন , "এ যুগের আবিষ্কার বিস্ময়কর ! আর না । তাঁর কাল গত হয়েছে । আর না ।"

এইভাবে 'আরোগ্য নিকেতনে' বিয়ালিটিই জয়যুক্ত হয়েছে , যদিও তার রূপায়ণ সম্পূর্ণ সার্থক হয় নি ।

(ছয়)

মানুষ বৃদ্ধ হ'লে তার জীবন স্মৃতিসর্বস্ব হ'য়ে ওঠে । স্মৃতিচারণ ক'রে , লাভ-ক্ষতির হিসেব-নিকেশ ক'রে তার দিন কাটে । জীবন মশায় এর ব্যতিক্রম নন । সম্প্রতির চেয়ে দেরি খেলেও আশি বছর বয়সের অভিজ্ঞতা তাঁকে বারবার অতীতের তীরে টানিত করেছে । জীবন মশায়ের স্মৃতির দুয়ার খুলে দিয়ে লেখক অতীতকে উন্মোচিত করেছেন , তেমনি বর্তমানে নবীন পর্বের প্রতিক্রিয়াকেও রূপায়িত করেছেন ।

'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের প্লট-গঠনে কাল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । এর কাহিনীকাল ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত । যদিও উপন্যাসের প্রকৃত সময় এক বছরের একটু বেশি । বর্তমানের মাঝে বহুবার অতীত ঘটনা ও চরিত্র এসেছে প্রধান চরিত্রের স্মৃতিচারণার সূত্রে । ফলে আপাত সময় প্রায় একশো বছর ধ'রে প্রসারিত । দীনবন্ধু-জগদ্বন্ধু—জীবন মশায় — মশায় বংশের তিন পুরুষের কথা উপন্যাসে এসেছে । এঁদের মধ্যে প্রধান চরিত্র ও স্মৃতিচারক বলে জীবন মশায়ই সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছেন । তাঁর আশি বছরের জীবনের বিচিত্র প্রসঙ্গ উপন্যাসে স্থান পেয়েছে । বর্তমান ও অতীত উপন্যাসের আদ্যন্ত সমান্তরাল-ভাবে চলেছে । অতীত ও বর্তমানের মিশ্রণে বহুবার মিশ্রকালও সৃষ্ট হয়েছে । কেন্দ্রীয় চরিত্র জীবন মশায় বর্তমানের ঘটনাধারার সঙ্গে জড়িত হয়েও বারবার অতীতের দিকে ফিরে তাকিয়েছেন । বর্তমান তাঁর কাছে বিস্ময়কর , অতীত তাঁর কাছে মায়াময় ('অতীত কালের কথার একটা নেশা আছে । বড় মনোরম বর্ণবিন্যাস । চোখে পড়লে আর

ফেরানো যায় না।') । বর্তমানের কোনো ঘটনার তরঙ্গাঘাতেই তাঁর মন অতীতচারী হয়েছে । এই মিশ্র কাল-চেতনাই উপন্যাসটির গঠনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ।

প্লটের গঠনশৈলীতে কালের পরই স্থানের ভূমিকা । বর্তমান উপন্যাসে স্থানগত ব্যাপ্তি অপেক্ষাকৃত কম, কালগত বিবর্তনের প্রাধান্য । উপন্যাসের প্রধান ঘটনাস্থল দেবীপুর । দু'চারটে ঘটনার স্থান নবগ্রাম । জীবন মশায়ের কৈশোর ও নবযৌবনের অধিকাংশ ঘটনার অকুস্থল কাঁদী শহর । স্থানগত ব্যাপ্তি কম থাকায় উপন্যাসটির প্লট দৃঢ়গঠনের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ।

আলোচ্য উপন্যাসে উপস্থাপিত প্রায় সমস্ত ঘটনা, পরিস্থিতি বা দৃশ্যের একমাত্র উদ্দেশ্য কেন্দ্রীয় চরিত্র — জীবনমশায়কে — বিকশিত ক'রে তোলা । জীবনের শেষ প্রহরে জীবন ম'শায় তাঁর আরোগ্য নিকেতনের বারান্দায় বসে ফেলে-আসা জীবনের স্মৃতি রোমন্থন করছিলেন —— তাঁর আশি বছরের জীবন । উপন্যাসে কোনো উপকাহিনী নেই । এর প্লটকে ঠিক শিথিল (Loose) বা দৃঢ়পিনদ্ধ (Organic) —— কোনোটিই বলা চলে না, — বরং উভয়ের লক্ষণই এতে মেলে ।

উপস্থাপনা পদ্ধতির দিক দিয়ে বিচার করলে 'আরোগ্য নিকেতনে'র প্লটকে 'Scenic' বলা চলে । কারণ জীবনের কোন একটি বিশেষ প্রবণতা (এক্ষেত্রে মৃত্যুচিন্তা)-র দিকে আলোকপাত করার তাগিদে লেখক প্লট নির্মাণ করেছেন। ফলে জীবনের নানামুখী বৈচিত্র্য এক্ষেত্রে বর্জিত হয়েছে । 'Scenic' বলেই এই উপন্যাসের গঠনশৈলী নাটকীয় ।

বিন্যাসপদ্ধতির দিক থেকে 'আরোগ্য নিকেতনে'র প্লট পশ্চাৎক্রম । কারণ, জীবন মশায়ের জীবন-পরিক্রমার বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও কিছু নির্বাচিত পার্শ্বচরিত্র একটি

ভাবদৃষ্টির সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। শেষের দিকে বৃদ্ধা মঞ্জরীর সঙ্গে জীবন মশায়ের দেখা হওয়ার মধ্যে বৃত্তের আভাস আছে।

(সাত)

জীবনমশায় : (নায়ক) উপন্যাসের নায়ক জীবনমশায়। আসন্ন মৃত্যুর ছায়ায় দাঁড়িয়ে তিনি জীবনে আলোছায়ার লীলা দেখেছেন। মৃত্যু লীলাময়ী; জীবনের পটে সে অজস্র বিচিত্র বর্ণের আলিম্পনরেখা এঁকে যায়। মৃত্যুর হিমশীতল দৃষ্টির সামনে মানুষের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া। যারা প্রাচীন জীবনধারা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী তারা শান্ত মনে আত্মসমর্পণ করে। আর যারা সম্ভোগ-বিলাসী তারা মৃত্যুর সম্ভাবনায় ব্যাকুল হ'য়ে তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে সর্বপ্রকারে সচেষ্ট হয়, তাকে সাহায্য করে আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা। জীবনমশায় কবিরাজ হ'লেও রঙলাল ডাক্তারের কাছে আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চা করেছিলেন। তবু তিনি শান্ত মনেই মৃত্যুকে মেনে নেন, এমনকি একমাত্র পুত্রের মৃত্যুকালেও। জীবনের অন্তিম প্রহরে নিজ মৃত্যুকে স্বাগত জানান। তাঁর মনের গড়ন ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুসারী।

তাই বলে জীবনমশায় জীবন-বিরোধী নন। ব্রতচারিণী সাবিত্রী মৃত্যুদেবতা যমকে পরাজিত ক'রে ফিরে পেয়েছিলেন স্বামীর জীবন। অভয়ার মুখে সেই পুণ্য ব্রতসংকল্পরেখা জীবনমশায় দেখেছেন। তা দেখে তাঁর মন নির্মেঘ আকাশের মতো ঝলমল ক'রে উঠেছে ——

"চিকিৎসক হিসেবে আমি জানি মৃত্যু পাপের বিচার করে না, পুণ্যের করে না; সে আসে ক্ষয়ের পথে। ক্ষয় যেখানে প্রবল সেখানে

সে অপরাজেয়, সে ধ্রুব। তবু আজ আমি বারবার আশীর্বাদ করছি, এ সত্য হোক, পরজন্মে তোমার স্বামীর জীবনে মৃত্যু প্রবল হলেও যেন তোমার পুণ্যবলের কাছে মৃত্যু হার মানে।" (পৃঃ - ৩০৮)

'এইখানেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনানুরাগী শিল্পী।'[৩০] আর এইখানেই তিনি সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্যেরও উত্তরাধিকারী।

মৃত্যু (নায়িকা) : উপন্যাসের নায়িকা 'সৃষ্টিকল্পের মূলাধারে, ধ্বংসের মহাজাগতিক বীজবস্তু মৃত্যু।'[৩১] উপন্যাসের সর্বত্র তার ভয়াল ছায়া পরিব্যাপ্ত। 'এখানে নায়ক্ও সম্পূর্ণরূপে নায়িকার উপর নির্ভরশীল, উহারই তত্ত্বরূপ-নিরূপণে ও রহস্যনির্ণয়ে সর্বতোভাবে আত্মনিয়োজিত, উহারই অঙ্গদ্যুতিতে উহার ব্যক্তিসত্তা আলোকিত ও বিকশিত।'[৩২]

জীবন মশায় বারংবার 'পিঙ্গলকেশিনী, অলক্ষ্যসঞ্চারিণী, রহস্যাবগুণ্ঠিতস্বরূপা মৃত্যুদেবী'-র[৩৩] পদধ্বনি শুনতে পেয়েছেন। একমাত্র সন্তান বনুর মৃত্যুর পর জীবনমশায় ভাবতেন—'যদি দেখা দেয় বনু তবে প্রশ্ন করবেন — মৃত্যু কী ? মৃত্যু কেমন ? কী রূপ ? কেমন স্পর্শ ? কেমন স্বাদ ?' মৃত্যুকালে বনবিহারী কেঁদেছিল, ভুবনরায় ধীরভাবে হিসেব-নিকেশ চুকিয়েছিল, গণেশ রায়েন পরমানন্দে জীবন-মহোৎসব করেছিল। তাহলে 'এই বিচিত্ররূপিণী বহুরূপার আসল পরিচয়টি কী ?' অন্ধ, বধির, পিঙ্গলকেশী মৃত্যুর স্বরূপ আবিষ্কারে জীবন মশায় আত্মমগ্ন। চিন্তার মধ্যে যাকে ধরতে পারেন নি, ছুঁতে পারেন নি, যার ধ্বনি শোনেন নি, নাড়ী ধরে যেন তার অস্তিত্ব তিনি স্পষ্ট অনুভব করেছেন। রহস্যময়ী মৃত্যুকে জানার পথ যেন নাড়ীজ্ঞান। 'এই উপন্যাসে মৃত্যু দার্শনিক প্রতীতি মাত্র নয়, জীবন্ত চরিত্র, সংসার তারই করধৃত।'[৩৪]

প্রদ্যোত : প্রদ্যোত ডাক্তার নবীন, এ যুগের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাবিদ্যায় বিশ্বাসী। প্রাচীন অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপদ্ধতি, নিদান হাঁকা, নাড়ীজ্ঞান —— এসবে তার বিশ্বাস নেই। সে ভাবে ——

"নতুনকাল, বিজ্ঞানের যুগ। অদৃষ্ট নিয়তি নির্বাসনের যুগ। ব্যাধিকে জয় করবে মানুষ। মৃত্যুর সঙ্গে সে যুদ্ধ করবে। মৃত্যুর মধ্যে অমৃত খুঁজেছে মানুষ অসহায় হয়ে। এবার জীবনের মধ্যে অমৃত সন্ধানের কাল এসেছে।"

এরপর লড়াই শুরু হয় প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র ও নবীন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের —— জীবন মশায়ের সঙ্গে প্রদ্যোত ডাক্তারের। সারা উপন্যাস জুড়ে এই লড়াই চলেছে এবং সেই লড়াইয়ের মাধ্যমে দুই ভিন্ন চিকিৎসাপদ্ধতি ও তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত দর্শনের পার্থক্য প্রদর্শিত হয়েছে।

যতির মার চিকিৎসাকে কেন্দ্র ক'রে জীবন মশায় ও প্রদ্যোত ডাক্তারের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। নানা ঘটনায় এই দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছেছে। শেষ পর্যন্ত একটি দুটি মেয়ে, বিশেষত স্ত্রীর চিকিৎসায়, প্রদ্যোতকে জীবন মশায়ের নাড়ীজ্ঞানের সহায়তা নিতে হয়েছে। এভাবেই প্রদ্যোত প্রাচীনকে খানিকটা মেনে নেয়। জীবন মশায়ের চরিত্র-মহিমা এবং সংবেদনশীল মনের সংস্পর্শে এসে প্রদ্যোতের মন স্নিগ্ধ হয়। জীবন মশায়ের অসুস্থতার সময় সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "শেষটায় ভদ্রলোকের সঙ্গে এমন জড়িয়ে গেলাম।" স্ত্রী মঞ্জুর প্রতি ভালোবাসায় প্রদ্যোতের মানব-সত্তার উন্মোচন।

এই উপন্যাসে উপরোক্ত তিনটি মুখ্য চরিত্র ছাড়া আরো বহু চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। জীবন মশায়ের চিকিৎসক জীবনের সঙ্গে অধিকাংশ চরিত্র যুক্ত। কিছু চরিত্র সম্পৃক্ত হয়েছে তাঁর ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে।

জীবন মশায়ের চিকিৎসক জীবনের সঙ্গে যে পার্শ্বচরিত্রগুলি যুক্ত তাদের 'রোগজর্জর সত্তার মধ্যে মানবাত্মার নানারূপ তির্যক প্রকাশ' [৩৫] লক্ষ্য করা যায়। রানা পাঠক, মহাপীঠের মোহান্ত সন্ন্যাসী, ভুবন রায়, গণেশ বায়েন — এরা মৃত্যুর সম্মুখে ধীর-স্থির, অচঞ্চল। অন্যদিকে জীবন মশায়ের একমাত্র পুত্র বনবিহারী, মতির মা, মঞ্জরী, দাঁতু ঘোষাল প্রমুখ 'অতৃপ্ত জীবনপিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ, জীবন-রসের শেষ বিন্দু পর্যন্ত উপভোগ করিবার ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায় উতলা-উন্মাদ' [৩৬]। এর মধ্যবর্তী স্তরে বিপিনের অবস্থান, যে 'অকালমৃত্যুর সম্মুখে লজ্জা-কুণ্ঠিত, দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাজিত বীরের ন্যায় আত্মগ্লানিতে মুহ্যমান।' [৩৭] সমালোচকের এই অভিমতের সঙ্গে আমরা একমত —

"মৃত্যুর নিকষকৃষ্ণ যবনিকার উপর ব্যাধির দমকা হাওয়ায় সঞ্চালিত জীবন-দীপশিখার এই বিচিত্র ভঙ্গিমার, নানা ছন্দের ও বিবিধ অন্তরভাবদ্যোতনার ছায়ানৃত্য লেখক এই উপন্যাসে অপরূপ রেখাবর্ণসমাবেশে ও তীক্ষ্ণ মনস্তত্ত্বজ্ঞান ও ভাবব্যঞ্জনার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন।" [৩৮]

এদের তুলনায় যে চরিত্রগুলি জীবন মশায়ের ব্যক্তি-জীবনের সঙ্গে যুক্ত তারা অনেকাংশে বর্ণবিরল ও জটিলতাহীন।

(আট)

'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসটি প্রত্যক্ষ বা মহাকাব্যিক পদ্ধতিতে রচিত। মহাকাব্যের বর্ণনায় যে সরলতা, স্পষ্টতা, প্রত্যক্ষতা ও ঋজুতা থাকে, এই পদ্ধতি অনেকাংশে তারই অনুসারী। লেখক এখানে সর্বজ্ঞ, সর্বত্র স্বাভাবিক বিচরণের সুযোগ পেয়েছেন তিনি। উপন্যাসের সঙ্গে নিজেকে তিনি সহজেই যুক্ত করতে পেরেছেন, নিজস্ব চিন্তাধারা প্রকাশ করতে পেরেছেন।

জীবনের বহুমুখী বৈচিত্র থেকে দৃষ্টি সংহরণ ক'রে ঔপন্যাসিক জীবনের একটি সুনির্দিষ্ট দিকে তাঁর দৃষ্টিকে সংহত রেখেছেন। মৃত্যুর কৃষ্ণ যবনিকার এপারে জীবনের যে অন্তিম পালা অভিনীত হয় লেখক সে দিকেই তাঁর লক্ষকে স্থির রেখেছেন। লেখকের মৃত্যু-ভাবনাই উপন্যাসে নানাছলে ফুটে উঠেছে। এই মৃত্যুচিন্তা অনেকটাই প্রাচীন ভারতীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত।

১। লেখকের মৃত্যু-ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে সেকাল ও একালের দ্বন্দ্বের পটভূমিতে। তাঁর বর্ণনায় এই দ্বন্দ্ব ফুটে ওঠে দেবীপুর ও নবগ্রামের বিপরীত চিত্রে —

(ক) "প্রাচীন কালের জমিদারদের বড় বড় নোনা ধরা পাকা বাড়ি। ভাঙা বাগান। ধসে-পড়া পাঁচিল। শ্যাওলা-ধরা মন্দির। পুকুরের ভাঙা ঘাট। পুরানো মন্দির। চারিদিকেই দেখবেন ধূলি-ধূসরতা; আবর্জনার স্তূপ। পতিত জায়গায় আগাছার জঙ্গল। এরই মধ্যে একজায়গায় পাবেন এক পুরানো বৃদ্ধ বট; শাখা-প্রশাখা জীর্ণ; গোড়াটা বাঁধানো; তাতেও দেখবেন অনেক ফাটল।"

(খ) "রাস্তার দুপাশে দোকান। .... প্রাণস্পন্দনে মুখরিত। মাল-বোঝাই গোরুর গাড়ির সারি চলেছে, মানুষ চলেছে, কোলাহল উঠছে, গন্ধও এখানকার বিচিত্র। বাজারটা দিন দিন বেড়ে চলেছে। ..... নবগ্রাম মেডিকেল স্টোর্সের ঝকঝকে বাড়ি, আসবাব, বহু বর্ণে বিচিত্র বিভিন্ন ওষুধের বিজ্ঞাপন আপনার দৃষ্টি অবশ্যই আকর্ষণ করবে।"

এই ধরনের বিপরীতধর্মী বর্ণনা বহুবার উপন্যাসে ঘুরে ঘুরে এসেছে— যা উপন্যাসের মূল সুরের সঙ্গে মানানসই।

২। ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্যের পটভূমিতে মৃত্যুর রূপ আঁকার প্রয়াস উপন্যাসের বহুক্ষেত্রে দেখা যায়। কখনো কখনো শ্লোকও উদ্ধৃত হয়েছে —

(ক) "পিঙ্গলকেশা, পিঙ্গলনেত্রা, পিঙ্গলবর্ণা; গলদেশে ও মণিবন্ধে পদ্মবীজের ভূষণ, অঙ্গে গৈরিক কাষায়" (মহাভারত অনুসারে মৃত্যুর বর্ণনা)

(খ) "সর্ব পাপ-পুণ্যের উর্ধ্বে তুমি। পাপ তোমাকে স্পর্শ করবে না। ..... কর্মফল তোমাকে আহ্বান করবে এই রোগেদের মাধ্যমে। অনাচার, অমিতাচার, ব্যভিচারের ফলে রোগাক্রান্ত হবে মানুষ। তুমি তাদের দেবে যন্ত্রণা থেকে মুক্তি, জ্বালা থেকে শান্তি, পুরাতন জন্ম থেকে নব জন্মান্তর।

(গ) "অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।"

তারাশংকরের বর্ণনার ভাষা বেশ নিস্পৃহ, মোহমুক্ত। ঘটনাস্থল থেকে বেশ একটু দূরে দাঁড়িয়ে লেখক যেন বর্ণনা করেছেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে এক নিষ্করুণ ঔদাসীন্য আছে। তবে 'আরোগ্য নিকেতনে' সর্বদা তিনি এই উদাসীনতা বজায় রাখতে পারেননি। অতীতের কথায় তাঁর ভাষা বেদনায় করুণ হয়েছে, অতীতের মোহ লেখককে বর্ণনার ক্ষেত্রে নির্মম ঐতিহাসিকের ভূমিকা নিতে বাধা দিয়েছে। উপন্যাসের বর্ণনায় এটা গুরুতর ত্রুটি নিঃসন্দেহে।

তারাশংকরের বর্ণনায় কাব্যধর্মিতা নেই। বরং তাঁর বর্ণনায় রুক্ষ কঠিন হাতের স্পর্শ মেলে। কোমল হাতের সূক্ষ্ম কাজ তাঁর বর্ণনায় নেই। তবে উপমার প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। বর্ণনায় নানাধরনের উপমা স্বাভাবিকভাবে গাঁথা হয়েছে; কখনো সে উপমা আটপৌরে, কখনো বা মহাকাব্যিক।

১। "শোকবিহ্বল পরিবারটির মধ্যে বসে থাকতেন অচঞ্চল হয়ে, গুমোটে ভরা বায়ুপ্রবাহহীন গ্রীষ্ম-অপরাহ্নের স্থির বনস্পতির মতো।"

২। ডাক্তার-গিন্নী "প্রভাতে ওঠেন যুদ্ধোদ্যতা দশপ্রহরণ ধারিণীর মতো।"

৩। "গিন্নীর দৃষ্টি এবং হুঙ্কার ভস্মলোচন ভস্মকারিণীর মতো প্রখর এবং ভীষণ হয়ে উঠবে।"

৪। "মাথার চুল সাদা হয়েছে, চোখের চাউনির মধ্যে বাপ-চাচার চাউনি ফুটে ওঠে, গোটা মানুষটাই শীতকালের গঙ্গানদীর জলের মতো পরিষ্কার।"

৫। "দেউলিয়া জমিদার ঘরের ছেলে। ওরা ভয়ঙ্কর। দাঁত-নখ-ভাঙা বাঘই হয় নরখাদক।"

৬। জীবনমশায় "ভালোবাসবেন তাকে রামায়ণের কাহিনীর ইন্দুমতীকে অজ রাজার ভালোবাসার মতো।"

৭। "আজ তাঁর অবস্থা গজভুক্ত কপিত্থের মতো।"

৮। "জ্যোৎস্নার একটা ফালি মলিন খানকাপড়-পরা একটি বিষণ্ণ নারীমূর্তির মতো দেওয়ালের গায়ে লেগেছিল।"

Robert Liddell -এর মতে উপন্যাস মানবজীবনের রূপকৃতি, আর উপন্যাসের পটভূমি রচনায় নিসর্গচিত্র একটি আকস্মিক যোগাযোগ মাত্র। যাঁটি উপন্যাসে, যেখানে ঘটনার স্রোতে ভাসমান চরিত্রই প্রধান, সেখানে পটভূমির মূল্য, রবার্ট লিডেলের মতে, অস্তিবাচক নয়, নেতিবাচক। অর্থাৎ কাহিনী এবং চরিত্রের মধ্যে যতটুকু প্রয়োজন, কেবল ততটুকু পটভূমিই উপন্যাসের পক্ষে সঙ্গত। চরিত্র ও ঘটনাকে পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরে নিজে অন্তর্হিত হ'য়ে যাওয়ার মধ্যেই পটভূমির সার্থকতা। যদি পটভূমি-বর্ণনা চরিত্র ও ঘটনাকে আচ্ছন্ন ক'রে অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় তবে সে প্রকৃতিবর্ণনা যত চিত্রধর্মী ও কাব্যধর্মীই হোক না কেন, পটভূমির সার্থকতা কেবল ততটুকুই যতটুকু তা চরিত্রের মনোভঙ্গীর সঙ্গে অন্বিত।

ঘটনা ও চরিত্রের রূপনির্মিতির প্রয়োজনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপন্যাসে সামাজিক বা প্রাকৃতিক পটভূমি আশ্রিত হয়। ঘটনা ও চরিত্রকে পরিস্ফুট করার দিক দিয়ে পটভূমি উপস্থাপনার সার্থকতা। উপন্যাসের পটভূমি যদি তদতিরিক্ত কোনো ভূমিকা গ্রহণ করে, এককথায় পটভূমি যদি উপযোগবাদের অন্তরায় হ'য়ে ওঠে তবে সেজাতীয় পটভূমির কোনো শিল্পমূল্য নেই। নিছক চিত্রধর্মী পটভূমি উপন্যাসের জীবনজিজ্ঞাসামূলক আবেদনের পরিপন্থী।

নিসর্গচিত্রের সংস্থাপন অনেকসময় মানবমনের প্রেক্ষিতে সংকেতধর্মী ক'রে উপস্থাপিত করা হয়। অবশ্য সেখানে নিসর্গের রূপ-বৈচিত্র্য বড় কথা নয়, বড় কথা হ'ল মানব-মন। প্রকৃতির বর্ষা মানবমনের অজস্র কান্নারই প্রতিফলন, শীতের শিহরণ মানব-মনের ভয়ের দ্যোতক হ'য়ে ওঠে। সাংকেতিক পটভূমির উপস্থাপনা যত সংক্ষিপ্ত ও ব্যঞ্জনাধর্মী হয় ততই ভালো।[৩১]

'আরোগ্য নিকেতনে' পটভূমি-বর্ণনায় তারাশংকর উপরোক্ত সূত্রগুলি মেনে চলেছেন। — উদাহরণ দিয়ে এ-কথা প্রমাণ করা যায়।

(ক) "সামনে পশ্চিম-দুয়ারী একতলা রান্নাঘরের চালার উপর দিয়ে, আচার্য ব্রাহ্মণদের বাড়ির উঠানের বকুল গাছের মাথার উপর দিয়ে রৌদ্রদগ্ধ বৈশাখী আকাশ যেন তপোমগ্ন রুদ্রের অর্ধনিমীলিত তৃতীয় নেত্রের বহ্নির ছটায় ক্লিষ্ট, নিথর।"

(খ) জীবন মশায়ের শূন্য জীবনের সঙ্গে প্রকৃতির মিল —

"অনাবৃষ্টির শেষ শ্রাবণের দুপুরবেলা; মেঘাচ্ছন্নতা রয়েছে, বৃষ্টি নাই। মাঠ শুকনো না হোক, অনাবাদী পড়ে রয়েছে। ফসল নাই কিন্তু আগাছা বেড়েছে।"

(গ) যেদিন জীবনমশায়ের একমাত্র পুত্র বনবিহারী মারা গেল —

"মশায় সেদিন শেষ রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে একা দাঁড়িয়ে ছিলেন আরোগ্য নিকেতনের দাওয়ার উপরে। ..... তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে তারাগুলিকে দেখছিলেন, কোথায় কোন্ তারা? কোথায় সপ্তর্ষি-মণ্ডল, অরুন্ধতী কোথায়? ধ্রুব? ধ্রুবতারা গেল কোথায়? কালপুরুষ? পূর্বদিগন্তে তখন দণ্ড দুয়েক আগে চাঁদ উঠেছে; কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীর চাঁদ। তাঁদের মতে ক্ষয়-রোগগ্রস্ত চাঁদ; পাণ্ডু বিবর্ণ, ক্ষয়িত কলেবর, পাঁচভাগের চারভাগ ক্ষয়ে গিয়েছে; ক্লান্তির আর পরিসীমা নাই যেন। জ্যোৎস্নাও ম্লান। আকাশে ছড়িয়েছে কিন্তু তাতে আকাশের দ্যুতি খোলে নাই। নীলিমার মধ্যেও যেন পাণ্ডুরতার ছায়া পড়েছিল।"

সামগ্রিক বিচারে 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তারাশংকর চূড়ান্ত সফল হয়েছেন বলা যায়। "আরোগ্য নিকেতন' তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের একটি। প্রাচীন ও নবীন চিকিৎসাশাস্ত্র কালসন্ধিক্ষণে মানুষের মনে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে 'আরোগ্য নিকেতনে' তার সার্থক চিত্র আছে।"[৪০]

(নয়)

'বিশ্বরূপা'— কর্তৃপক্ষের অনুরোধে তারাশংকর তাঁর 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসটির নাট্যরূপ দান করেন। 'আরোগ্য নিকেতন' নাটক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ১৩৬৩ সালের ভাদ্র মাসে। এই নাটকটির অভিনয়ের মাধ্যমে 'বিশ্বরূপা' মঞ্চের দ্বারোদ্ঘাটন হয় (৭ জুন, ১৯৫৬)। নাটকটির অভিনয় দেখে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন, "নাটকটির মৌলিকতা ছাড়াও রূপসজ্জা ও

সম্মিলিত অভিনয় নিষ্ঠা অনবদ্য।"[৪১] নাটকটির ৫০তম অভিনয়-অনুষ্ঠান উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশেষ উৎসব-সভায় (২১ অগস্ট, ১৯৫৬) প্রধান অতিথি বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, "এই নাটক একটি সুন্দর নাটক এবং অভিনয়ও হয়েছে তার চমৎকার।"[৪২] নাটকটির মঞ্চসাফল্য অনস্বীকার্য। নাটকটির অভিনয় প্রভূত জন-সমাদর লাভ করেছিল। সমকালীন পত্রিকাগুলি তার সাক্ষী।

"নাট্যগুণ তাঁর লেখার একটি প্রধান বিশেষত্ব। তাঁর অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসেই এ গুণটি দেখা যায়[৪৩]। নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত মন্তব্য করেছিলেন, "তারাশঙ্করবাবুর উপন্যাসগুলির মধ্যেও প্রচুর নাটকীয় উপাদানের সমাবেশ ঘটেছে।"[৪৪] বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র মন্তব্য করেছেন, "তারাশংকরের বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যেও এত নাটকীয় উপাদান আছে যে সেগুলিকে সহজেই নাট্যরূপায়িত করা চলে।"[৪৫] 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসটিতেও প্রচুর নাটকীয় উপাদানের সমাবেশ ঘটায় এর নাট্যরূপায়ণ সহজ হয়েছে।

উপন্যাসকে নাটকে রূপান্তরিত করার সময় নাট্যকারকে মনে রাখতে হয় যে 'নাটক এক ভিন্ন শিল্পরূপ।'[৪৬] উপন্যাসে দ্বন্দ্ব বা সংঘাত অনিবার্য নয়, কিন্তু নাটকে তা অত্যাবশ্যক। কারণ, দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে কেন্দ্র ক'রেই নাটকের প্রতিমা গ'ড়ে ওঠে। Bernard Shaw বলেছেন, "conflict is the life and soul of a drama." 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে চিকিৎসা ও আরোগ্যের প্রেমিতে প্রাচীন ও নবীনের দ্বন্দ্ব রূপায়িত হয়েছিল। উপন্যাসে এই দ্বন্দ্বের বহুশাখায়িত রূপায়ণ ঘটেছিল, নাটকে তাকে গুটিয়ে আনা হয়েছে। কারণ যা শুধু অপরিহার্য, অনিবার্য তাই নিয়েই নাটক। উপন্যাসের বৃহৎ প্রেক্ষাপটে যে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছিল, নাটকের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রেমিতে তাকে আরো তীব্র ও গভীর ক'রে তোলা হয়েছে। নাটকটি তীব্র গতিবেগযুক্ত এবং আদ্যন্ত দ্বন্দ্ব-সংঘাতে পরিপূর্ণ। 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাস হিসেবে যথেষ্ট দীর্ঘ অথচ নাটকটি আকারে

পরিমিত , — দু'ঘন্টা , আড়াই ঘন্টার মধ্যে অভিনয়যোগ্য । ফলে বহু ঘটনা , চরিত্র , নাটকীয় মুহূর্ত বাদ দিতে হয়েছে ।

'কালিন্দী' ও 'কবি' উপন্যাসদুটিকেও তারাশংকর নাট্যরূপ দিয়েছেন । কিন্তু তাদের তুলনায় 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসের মতো সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনাপূর্ণ একটি বৃহৎ উপন্যাসকে সংক্ষিপ্ত , সংহত , রসঘন , গতিবেগ - চঞ্চল শ্রেষ্ঠ নাটকে পরিণত করা ছিল অত্যন্ত কঠিন । থীম হিসেবে মৃত্যু , ব্যাধি , চিকিৎসা ও আরোগ্যকে গ্রহণ করায় 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে বর্ণনা ও বিশ্লেষণের (narration) একটি বড় ভূমিকা রয়ে গেছে , বিশেষত মৃত্যুর স্বরূপ নিয়ে জীবন ম'শায়ের আধ্যাত্ম-নির্ভর চিন্তার বিবরণদানের ক্ষেত্রে । নাটকের সংলাপে , বিশেষত জীবন ম'শায়ের কথাবার্তায় খানিকটা বিবৃতিধর্মিতা স্বভাবতই প্রশ্রয় পেয়েছে । কিন্তু জীবন মশায়ের চরিত্রের সঙ্গে তা মানিয়ে গেছে ।

উপন্যাসের মতো নাটকেরও কেন্দ্রীয় চরিত্র জীবন মশায় । উভয়ত তিনি এক । নাট্য-রূপান্তরে লেখক তার চরিত্রের কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন নি । তবে উপন্যাসের অনেকটা স্থান জুড়ে জীবন মশায়ের প্রথম যৌবনের কথা , কাঁদার মেডিক্যাল স্কুলে পড়তে গিয়ে মঞ্জরীকে ভালোবাসা , তাই নিয়ে দুর্দান্ত ভূপী বোসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা , শেষে পরাজিত হ'য়ে পলায়ন , ডাক্তারি পড়া ছেড়ে পিতা জগৎ মশায়ের কাছে কবিরাজি শেখা , শেষজীবনে বৃদ্ধা বিধবা মঞ্জরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ — এককথায় উপন্যাসের জীবন মশায় — মঞ্জরী — ভূপী বোসের শাখা-কাহিনী নাটকে পরিত্যক্ত হয়েছে । রঙলাল ডাক্তারের কাছে জীবন মশায় আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা রপ্ত করেছিলেন । সে প্রসঙ্গও নাটকে পরিত্যক্ত । ফলে উপন্যাসে জীবন মশায়ের ব্যক্তি-সত্তার যে সমগ্র রূপটি দেখি নাটকে তা ঈষৎ খন্ডিত । নাটকের গঠনগত ঐক্যের স্বার্থেই নাট্যকারকে উপন্যাসের বেশ কিছু ঘটনা ও চরিত্র বর্জন করতে হয়েছে । উপন্যাসে জীবন মশায়ের চরিত্র বহুবর্ণময় , নাটকে তাঁর চরিত্র খানিকটা বিবর্ণ । তবে চরিত্রের

মূল কাঠামো, বিশেষত মৃত্যু সম্পর্কে দৃষ্টিকোণ উভয়ত এক। নিজ আদর্শ ও বিশ্বাসে তিনি অবিচল। তীক্ষ্ণ তাঁর নাড়ীজ্ঞান। অব্যর্থ তাঁর নিদান। সত্য-ভাষণে নির্ভয়, নির্দ্বিধ। আপাতদৃষ্টিতে খানিকটা দাম্ভিক।

উপন্যাসে জীবন মশায় তাঁর একমাত্র পুত্র বনবিহারীর মৃত্যু-ঘোষণা পূর্বাহ্নে করেছিলেন। নাটকেও তা-ই। শুধু বনবিহারীর নাম পরিবর্তিত হয়েছে সত্যবন্ধুতে। কিন্তু বনবিহারীর জীবন-কথার সঙ্গে সত্যবন্ধুর জীবন-কথার অমিল বিস্তর। বনবিহারীর মতো সত্যবন্ধুও ডাক্তারি পড়েছিল। কিন্তু সত্যবন্ধু ডাক্তারি পড়তে গিয়ে গোপনে বিয়ে করেছিল। একটি পুত্রও নাকি হয়েছিল। ধর্ম-ও জাতিগত ভিন্নতাহেতু লজ্জায় পিতামাতাকে সে-কথা জানাতে পারেনি। সত্যবন্ধুর মৃত্যুর পর পুত্রবধূ বা পৌত্রের কোনো খবর পাননি জীবন মশায়। সস্ত্রীক জীবন মশায় মাঝে মাঝে ভাবেন তাদের কথা। নানা প্রশ্ন জাগে। অন্যদিকে বনবিহারীর বিয়ে দিয়েছিলেন জীবন মশায় নিজে। অমিতাচারে, অনাচারে রোগগ্রস্ত হ'য়ে সে মশায় বংশের দীর্ঘ পরমায়ু থেকে বঞ্চিত হয়, অকালে প্রাণ হারায়। বনবিহারীকে কেন্দ্র ক'রে কোনো রহস্যের ছায়া উপন্যাসে প্রসারিত হয়নি। অথচ সত্যবন্ধুর বিবাহ, তার স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে নাটকে 'Suspence' জমাট বেঁধেছে।

নবগ্রাম হেল্‌থ সেন্টারে তরুণ ডাক্তার প্রদ্যোতের আগমনে বৃদ্ধ কবিরাজ জীবন মশায়ের চিকিৎসাপদ্ধতি, তাঁর মৃত্যুচিন্তা, তাঁর জীবনদর্শন — সামগ্রিকভাবে তাঁর অস্তিত্ব — সহসা প্রবলবেগে নাড়া খেল। জীবন মশায়ের নিদান হাঁকাকে প্রদ্যোতের নিষ্ঠুরতা ব'লে মনে হয়। সেকথা জীবন মশায়কে সে জানিয়েও দেয় — 'এটা মরার যুগ নয়, বাঁচার যুগ।' আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান খুব উন্নত। তা মানুষকে ব্যাধির বিরুদ্ধে লড়তে সাহায্য করে। দ্বন্দ্ব বাধলেও জীবন মশায় এই তরুণ ডাক্তারটিকে ভালোবেসেছিলেন। এমনকি একটি অসুস্থ ছেলেকে নিজে নিয়ে যান প্রদ্যোতের কাছে। প্রদ্যোতের চিকিৎসায় ছেলেটি ভালো হয়। ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে জীবন মশায় ও প্রদ্যোত ডাক্তারের চিকিৎসাপদ্ধতি এবং জীবন ও মৃত্যুচিন্তার

মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধে। এই দ্বন্দ্ব চরম (Climax) -এ পৌঁছয় বৃদ্ধ জমিদার ভুবন রায়ের চিকিৎসা নিয়ে। জীবন মশায়ের নিদান ঘোষণাকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে ভুবন রায়কে সুস্থ ক'রে তোলে প্রদ্যোত। এই সূত্রে ভুবন রায়ের দৌহিত্রী মঞ্জুর সঙ্গে পরিচয় হ'ল প্রদ্যোতের। কৃতজ্ঞ ভুবন রায় খুশি হ'য়ে প্রদ্যোত-জননীর কাছে মঞ্জুর সঙ্গে প্রদ্যোতের বিয়ের প্রস্তাব করেন। উপন্যাসে ভুবন রায় চরিত্রটি ছিল না। মঞ্জু চরিত্রটি ছিল। সেখানে সে প্রদ্যোতের স্ত্রী। তাদের প্রেম বিবাহ-উত্তর। তাকে নিয়ে কোনো জটিলতাও নেই।

কিন্তু নাটকে মঞ্জুর সঙ্গে প্রদ্যোতের বিয়ে উপলক্ষে দেখা দেয় নতুন সমস্যা। প্রদ্যোত তার বংশপরিচয় গোপন রাখতে চায়। কুলপরিচয়হীন প্রদ্যোতের সঙ্গে দৌহিত্রীর বিয়ে দিতে অসম্মত হন ভুবন রায়। প্রদ্যোতকে তিনি অপমান করেন। অপমানের জ্বালায় প্রদ্যোত অসুস্থ হ'য়ে পড়ে। প্রদ্যোতের রোগলক্ষণে বিস্মিত হন জীবন মশায়। এ-রোগেই তাঁর একমাত্র পুত্র সত্যবন্ধুর মৃত্যু হয়েছিল। অভিমানী সত্যবন্ধু তাঁর ওষুধ গ্রহণ করেনি। প্রথম যৌবনে জীবন মশায় নিজেও এ-রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এ-রোগ বংশগত। শেষ পর্যন্ত জীবন মশায়ের ওষুধে আরোগ্য লাভ করে প্রদ্যোত। জীবন মশায়ের কাছে সে আত্ম-পরিচয় দান করে। সস্ত্রীক জীবনমশায় পুত্রবধূ ও পৌত্রকে বরণ ক'রে নেন।

নাটকের জীবনমশায় শুধু চিকিৎসকই নন, স্থিতপ্রজ্ঞ দার্শনিকও। তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে রোগীর অসুখ ছাড়াও আরো অনেক কিছু ধরা পড়ে। তাঁর বিশ্বাস—মানুষের ব্যাধির মূলে আছে রিপুর তাড়না। রিপুমুক্ত না হ'লে ব্যাধিমুক্ত হওয়া যায় না। শুধু ওষুধে ব্যাধি নির্মূল হয় না। ভুবন রায় ও দাঁতু ঘোষাল — দু'জনের মধ্যেই তৃতীয় রিপুর প্রাবল্য দেখেছেন জীবন মশায়। প্রদ্যোতও শেষ পর্যন্ত এর সত্যতা স্বীকার করেছে।

জীবন মশায় জীবনপ্রেমী , মানবপ্রেমী । মৃত্যুকে তিনি জীবনের অনিবার্য পরিণাম বলে মনে করতেন । মৃত্যুকে তিনি প্রসন্নচিত্তে বরণ ক'রে নিতে চান । মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের সন্ধান করেছেন তিনি । অপূর্ব এক মানসিক ঔদার্যের অধিকারী তিনি । কোনো মিথ্যা সংস্কার তাঁর কাছে প্রশ্রয় পায় নি । পুত্রবধূ ও পৌত্রকে তিনি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন ।

উপন্যাসের আত্র-বউ থেকে নাটকের আত্র-বউ স্বতন্ত্র । নাটকের আত্র-বউ স্বামী-গত-প্রাণা । স্বামীর আদর্শ ও বিশ্বাসকে সর্বতোভাবে গ্রহণ করেছেন তিনি । উপন্যাসের আত্র-বউ এমন ছিলেন না ।

নাটকের প্রদ্যোত মশায় বংশের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী । অল্প বয়সেই সে নিপুণ চিকিৎসক । অসাধারণ তার আত্মমর্যাদাবোধ । স্বীয় নীতি ও আদর্শরক্ষায় দৃঢ়-সংকল্প । প্রয়োজনে রূঢ়ভাষী , আবার ভুল স্বীকারে অকুণ্ঠিত । প্রদ্যোতের দেহে যে মশায় বংশের রক্ত প্রবাহিত , তার আচরণাদিই তার প্রমাণ ।

উপন্যাসের প্রদ্যোতের আদলেই নাট্যকার নাটকের প্রদ্যোতকে গড়ে তুলেছেন। তার সঙ্গে জীবন মশায়ের রক্তের সম্পর্ক স্থাপন এবং তা নিয়ে জটিলতা নাটকে অতিরিক্ত সংযোজন । এই সংযোজনায় নাট্যগুণ বৃদ্ধি পেলেও উপন্যাসে ঘটনা-গ্রন্থনে ও চরিত্রচিত্রণে যে স্বাভাবিকতা ছিল তা যে অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হয়েছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই ।

প্রদ্যোত-জননী সুধা আদর্শ মাতা । বৈধব্য তাঁকে ম্লান করেনি । মশায় বংশের ঐতিহ্যকে নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সঙ্গে বহন ক'রে চলেছেন তিনি । এই চরিত্রটি উপন্যাসে ছিল না। নাটকের স্বার্থেই এই চরিত্রটি সৃষ্ট হয়েছে ।

উপন্যাসের বহুধাবিস্তৃত কাহিনীকে নাট্যকার শেষ পর্যন্ত একটি পারিবারিক প্রেক্ষাপটে সীমাবদ্ধ করেছেন । ফলে নাটকটি যতটা সামাজিক চরিত্র পেয়েছে তার চেয়ে বেশি পেয়েছে পারিবারিক চরিত্র ।

চরিত্রানুগ সংলাপ রচনার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। তাঁর অন্যান্য নাটকে সংলাপ রচনায় যে দক্ষতার পরিচয় তারাশংকর দেখিয়েছেন এই নাটকেও তা বজায় আছে। তবে কোথাও কোথাও সংলাপের দীর্ঘতা ক্লান্তিকর হ'য়ে উঠেছে। যেমন, জীবন মশায়ের সংলাপ।

তারাশংকরের সব নাটকেই গানের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। 'আরোগ্য নিকেতন'—এ নিজের লেখা গান ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের গানের সাহায্যও নিয়েছেন তিনি। গানগুলির ব্যবহার সুষ্ঠু ও পরিমিত। এতে নাটকীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তবে উপন্যাসের মতোই নাটকটিও একটি মহৎ বাণীকে আশ্রয় ক'রে গড়ে উঠেছে। সমালোচক সেদিকে সংকেত করেছেন —

"এই নাটকে জীবনের এমন একটি আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের সন্ধান পাওয়া যায় — অতীত, সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের মধ্যেও যার আকর্ষণ অম্লান। .... 'আরোগ্য নিকেতন' - নাটক হয়েও সত্য ও শাশ্বত, রঙ্গ হয়েও জীবন ও মৃত্যুর এক রূপময় ও বাঙময় ব্যাখ্যা এবং সেই হিসেবে সুগত ব্যতিক্রম।"[৪৭]

নাটকটি ঘনসন্নিবদ্ধ গঠনের, দ্বন্দ্ব-সংঘাতে আদ্যন্ত পরিপূর্ণ। সমালোচকের অভিমত যুক্তি-সম্মত বলেই মনে হয় —

"প্লট-গ্রন্থনে, চরিত্র-চিত্রণে, সংলাপ ও সংগীত যোজনায়, নাট্যগতি সঞ্চারে তারাশঙ্করের নাট্য-প্রতিভার সমুন্নত প্রকাশ ঘটেছে এ-নাটকে।"[৪৮]

তবু সামগ্রিক বিচারে 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাস তারাশংকরের সৃষ্টি-প্রতিভাকে যে উন্নত মানে পৌঁছে দিয়েছিল নাটকটি কিন্তু সেই পর্যায়ে তাঁর প্রতিভাকে উন্নীত করতে পারেনি।

।। উল্লেখপঞ্জী ।।

১। চন্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় : গ্রন্থ-পরিচয় : তারাশংকর রচনাবলী : দশম খন্ড : মিত্র ও ঘোষ : ১৩৮২ : পৃঃ- ৫২২ ।

২। তদেব

৩। তদেব , পৃঃ - ৫২৬ ।

৪। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'স্বরাজ্যে স্বরাট' : আনন্দবাজার পত্রিকা : বুধবার : ২৯শে ভাদ্র , ১৩৭৮ ।

৫। জগদীশ ভট্টাচার্য : তারাশংকরের গল্পগুচ্ছ : ২য় খন্ড : ১৯৮৫ : ভূমিকা : পৃঃ - ৬৩ ।

৬। চন্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় : গ্রন্থ-পরিচয় : তারাশংকর রচনাবলী : দশম খন্ড : মিত্র ও ঘোষ : ১৩৮২ : পৃঃ- ৫২৫ ।

৭। তারাশংকর : আমার কালের কথা : স্মৃতিকথা : ১ম খন্ড : ১৩৯৪ : পৃঃ ২৭ - ৩৬ , ১১৭ ।

৮। তদেব , পৃঃ - ১১৮ - ১২১ ।

৯। তদেব , পৃঃ - ১২০ - ১২১ ।

১০। তারাশংকর : আমার সাহিত্য-জীবন (১ম খন্ড) : স্মৃতিকথা : ১ম খন্ড : ১৩৯৪ : পৃঃ - ৩৩৮ ।

১১। তারাশংকর : আমার সাহিত্য-জীবন (১ম খন্ড) : স্মৃতিকথা : ১ম খন্ড : ১৩৯৪ : পৃ: - ৩৪১ ।

১২। তদেব

১৩। জগদীশ ভট্টাচার্য : তারাশংকরের গল্পগুচ্ছ (১ম খন্ড) : ১৯৮৬ : ভূমিকা : পৃ: - ৪৫ ।

১৪। তারাশংকর : আমার সাহিত্য-জীবন (১ম খন্ড) : স্মৃতিকথা : ১ম খন্ড : ১৩৯৪ : পৃ: - ৩৩৮ ।

১৫। তদেব

১৬। ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : ৫ম সংস্করণ : ১৩৭২ : পৃ: - ৫৭০ - ৭১ ।

১৭। তদেব , পৃ: - ৫৭১ ।

১৮। তদেব

১৯। তারাশংকর : আমার সাহিত্য-জীবন (১ম খন্ড) : স্মৃতিকথা (১ম খন্ড) : ১৩৯৪ : পৃ: - ২৭ - ৩৬ ।

২০। চন্ডীদাস চট্টোপাধ্যায় : গ্রন্থ-পরিচয় : তারাশংকর রচনাবলী : দশম খন্ড : মিত্র ও ঘোষ : ১৩৮২ : পৃ:- ৫২৫ ।

২১। ড: অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : ভূমিকা : তারাশংকর রচনাবলী : দশম খন্ড : মিত্র ও ঘোষ : ১৩৮২ : পৃ: - ৩ ।

২২। "বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা—
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।" শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : ২, ২২।

২৩। ডঃ ধীরেন্দ্র দেবনাথ : রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু : ১ম সং, ১৯৬৬ : পৃঃ - ৫৩।

২৪। ডঃ আশিসকুমার দে : উপন্যাসের শৈলী : ১৯৮৩ : পৃঃ - ৩৫।

২৫। ডঃ অশ্রুকুমার সিকদার : আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস : ১৯৮৮ : পৃঃ - ১১৮।

২৬। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : ৫ম সং : ১৩৭২ : পৃঃ - ৫৭৬।

২৭। ডঃ কার্তিক লাহিড়ী : বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস : ১ম সং : ১৯৭৪ : পৃঃ - ৪৯।

২৮। তদেব, পৃঃ - ৫০।

২৯। ডঃ অলোক রায় : আরোগ্য নিকেতনে যুগান্তরের স্বরূপ : তারাশংকর অন্বেষা : সম্পাদনা— সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : ১৯৮৭ : পৃঃ- ১৬৬।

৩০। ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : তারাশংকর রচনাবলী : দশম খণ্ড : মিত্র ও ঘোষ : ১৩৮২ : ভূমিকা : পৃঃ - ৬।

৩১। তদেব, পৃঃ - ৪।

৩২। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : ৫ম সং, ১৩৭২ : পৃঃ - ৫৭৩।

৩৩। তদেব, পৃঃ - ৫৭৫।

৩৪। ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : তারাশংকর রচনাবলী : দশম খণ্ড : মিত্র ও ঘোষ : ১৩৮২ : ভূমিকা : পৃঃ- ৫।

৩৫। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা : ৫ম সং : ১৩৭২ : পৃঃ - ৫৭২।

৩৬। তদেব, পৃঃ - ৫৭৩।

৩৭। তদেব, পৃঃ - ৫৭৩।

৩৮। তদেব, পৃঃ - ৫৭৩।

৩৯। Robert Liddell : A Treatise on the Novel : 1965.

৪০। ডঃ মুক্তি চৌধুরী : ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর : ১৯৭৭ : পৃঃ - ৭১।

৪১। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : যুগান্তর : শনিবার : ১৪ জুলাই, ১৯৫৬।

৪২। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় : যুগান্তর : শুক্রবার : ২৪ আগস্ট, ১৯৫৬।

৪৩। মানস মজুমদার : নাট্যকার তারাশঙ্কর : ১৯৭৭ : পৃঃ - ৫৭ ।

৪৪। তদেব , পৃঃ - ৭১ ।

৪৫। তদেব , পৃঃ - ৭৫ ।

৪৬। তদেব , পৃঃ - ৭৬ ।

৪৭। যুগান্তর : নাটমঞ্চ : শুক্রবার : ১৩ জুলাই , ১৯৫৬ ।

৪৮। মানস মজুমদার : নাট্যকার তারাশঙ্কর : ১৯৭৭ : পৃঃ - ৫৫ ।